ঔপনিবেশিক বাংলার মহামারির ইতিহাস ও ছাত্রসমাজ

সৌমি অধিকারী[১] এবং শিপ্রা সিংহ রায়[২]

ইতিহাস বিভাগ, বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ, হাওড়া

৫/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

[১]sinharoyshipra@gmail.com; [২]soumi01adhikary@gmail.com

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল, ঔপনিবেশিক বাংলার মহামারির ইতিহাস এবং এই মহামারির মোকাবিলায় ছাত্রসমাজের ভূমিকা কি ছিল, তা পর্যালোচনা করা। ঔপনিবেশিক বাংলায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, কালাজ্বর, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বারম্বার মহামারি রূপে বাংলার জনজীবন বিধ্বস্ত করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ রোগ কীভাবে তৎকালীন বঙ্গে মহামারির আকার ধারণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, এই মহামারি মোকাবিলায় ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা কী ছিল দেশীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল, এবং ছাত্রসমাজ কীভাবে মহামারির প্রতিকারে এগিয়ে আসে তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ : মহামারি, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, প্লেগ, কোভিড – ১৯, ছাত্রসমাজ

কোন সংক্রামক রোগ যখন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর মাঝে খুব দ্রুত সংক্রমিত হয়ে পড়ে; তখন বলা হয় রোগটি মহামারির আকার ধারণ করেছে। পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য মহামারির ঘটনা ঘটেছে এবং এসব মহামারিতে মৃত্যু হয়েছে কোটি কোটি মানুষের। এসব মহামারিতে প্লেগ আর ফ্লুর নামই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। অনেক সময় দেখা যায়, নানা কারণে একটি ছোট অঞ্চলে প্রাদুর্ভাব ঘটা রোগ ছড়িয়ে যায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। তখন এই মহামারি রূপ নেয় প্যান্ডেমিক বা বিশ্বমারীতে। ২০২০, বিশ্বের মহামারির ইতিহাসে তার জায়গা করে নিয়েছে কোভিড-১৯ মহামারির জন্য। চীনের উহান প্রদেশ থেকে যাত্রা শুরু করে এখন এটি বিশ্বমারীতে পরিণত। যে ভয়াবহতা নিয়ে তা বিশ্ব মানুষের জীবনে নেমে এসেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও তার তাণ্ডব নৃত্য অব্যাহত। তবে এই বঙ্গদেশ যুগে যুগে মহামারি বিধ্বস্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের কবিতার একটি লাইন প্রণিধানযোগ্য-

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি।"

বহু প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশ মহামারির দ্বারা আক্রান্ত হলেও ঔপনিবেশিক আমলে মহামারির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। এর জন্য অতি অবশ্যই ঔপনিবেশিক আমলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি এবং তার হাত ধরে মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধিকে দায়ী করা যায়। ঔপনিবেশিক আমলে ক্রমপর্যায়ে একাধিক রোগ মহামারির আকার ধারণ করে। এই রোগ সমূহ কীভাবে মহামারির আকার ধারণ করে, এবং সেই সময় ছাত্র সমাজের ভূমিকা কি ছিল, তা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া জ্বর ভারতীয়দের কাছে অজানা ছিল না। ভারতীয়দের সাথে এই রোগের জীবাণুর পরিচয় সুদীর্ঘ অতীত কাল থেকে। এই রোগের উল্লেখ পাই, অথর্ব বেদ থেকে।[১] প্রাচীন ভারতের গান্ধার, মগধ নামক জনপদে ম্যালেরিয়ার উল্লেখ

রয়েছে।[২] ম্যালেরিয়া মশা বাহিত একটি রোগ। এই প্রাণঘাতী মহামারির বাহক বিষাক্ত মশা দূরীকরণে বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ধোঁয়ার ব্যবহারের কথা জানা যায়, প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে।[৩]

পরবর্তী কালে চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা নামক চিকিৎসা শাস্ত্রে তাপমাত্রা (জ্বর) সহ ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ ও প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের কাছাকাছি চরক সংহিতা এবং খ্রিষ্টপূর্ব ১০০ অব্দের কাছাকাছি সুশ্রুত সংহিতাতে এই রোগের প্রধান লক্ষণ জ্বরকেই চিহ্নিত করা হয়েছিল।[৪] এই দুই চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে, এই জীবাণুর বাহক বিষাক্ত মশাদের বাসস্থান নিচু জলাভূমি। তৎকালীন সমাজে এই রোগ থেকে বাঁচবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং অথর্ব বেদ, চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে মশা এবং ম্যালেরিয়ার যোগসূত্রটি অজানা ছিল না। তবে ঔপনিবেশিক আমলে কী করে এই রোগটি মহামারিতে পরিণত হয়েছিল, তার সপক্ষে প্রমাণ খুবই অল্প। তবে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থ যে এর জন্য দায়ী ছিল তা বলাই বাহুল্য। এক গ্রাম্য কবির কবিতায় রেলপথের বিস্তারকে ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী করে লেখা হয়েছিল –

"রেলওয়ে বিস্তার অন্য ম্যালেরিয়া হেতু

বঙ্গদেশে যেন ইহা ভীম ধুমকেতু।

প্রাকৃতিক জলের প্রণালী যত রয়,

রেলপথে যে-সকল অবরুদ্ধ হয়।

কৃত্রিম প্রণালী কর্তৃপক্ষের নির্মাণ,

পর্যাপ্ত বলিয়া নাহি হয় অনুমান।

না পাইয়া নির্গমের পথ রীতিমত

সুচারুরূপেতে জল হয় না নির্গত।

রুদ্ধবারি নানাস্থানে থাকে দাঁড়াইয়া

পচে নানা আবর্জনা সে জলে পড়িয়া।

অতএব ম্যালেরিয়া জনমে সেখানে,

রেল রোড এইরূপে ম্যালেরিয়া আনে।"[৫]

ম্যালেরিয়া যখন মহামারির আকার ধারণ করেছিল, তখন বাংলাও এই মহামারির প্রকোপ থেকে মুক্তি পায় নি। বাংলা নদী-নালা সমৃদ্ধ। তাই এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশি। ব্রিটিশ প্রশাসনের কাঠামোগত পরিবর্তন এবং ক্ষয় এই মহামারিকে তরান্বিত করেছিল। বাংলার গ্রামের জলাশয়ে পাট পচানোর কাজ শুরু হয় সুদীর্ঘ অতীত থেকে। এর ফলে একটি বিশৃঙ্খল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সূচনা হয়েছিল, যা এই রোগের বাহক মশাদের প্রজননে সাহায্য করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে ম্যালেরিয়া মহামারি বেশ কয়েকবার মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ভারতে প্রতিবছর ১ কোটি মানুষ এই রোগে

আক্রান্ত হত এবং এক বছরে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এই রোগে মৃত্যুবরণ করত।[৬] ১৯২০ সালে সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে এক জৈব রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যা কুইনাইনিন নামে পরিচিত।[৭] কুইনাইনের আবিষ্কারের ফলে এই রোগের প্রকোপ ক্রমশ কমতে থাকে।

ঔপনিবেশিক সরকারের ম্যালেরিয়া নীতি পত্র-পত্রিকাগুলিতে সমালোচিত হয়। এই রোগে কেবল যে অনেক লোকের মৃত্যু হত তাই নয়, যারা বেঁচে থাকত, তাদের দৈহিক শক্তি কমে যেত ও প্রজনন শক্তি ক্ষুণ্ণ হত। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা কটাক্ষ করে দৈনিক বসুমতী লিখেছিল – "সরকারও স্বীকার করে, যে কুইনাইনগুলো চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানো হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। যখন কুইনাইনগুলো পোস্ট অফিসে আসে তখনই চড়া দামে কালো বাজারে বিক্রি হয়ে যায়।"[৮]

কলেরা

ঔপনিবেশিক ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলেরা মহামারি হিসেবে প্রকাশিত হয়। তৎকালীন সমাজে ভারত তথা বাংলাতে বসবাসকারী ইউরোপীয় অভিজাতরা এই রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয় নি। তৎকালীন বাংলার গ্রাম্য কৃষক ও শ্রমিক সমাজ মারাত্মকভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কলেরা হল একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। Vibrio Cholerae নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এই রোগটি সংঘটিত হয়।[৯] ইতালিয় বিজ্ঞানী Filippo Pracini এই ব্যাকটেরিয়াটি আবিষ্কার করেন।[১০] রাশিয়াতে প্রথম এই রোগটি মহামারির আকার ধারণ করে। এরপর ভারত এবং বাংলাতেও এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। ভারতে প্রথম কলেরা আক্রান্তের ঘটনাটি ঘটে ১৮১৭ সালের ২৩ শে আগস্ট যা যশোরের একজন সিভিল সার্জন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।[১১] ক্রমে এটি মহামারির আকার ধারণ করে। প্রথম কলেরা মহামারিতে মৃত্যুর হার জানা যায়নি। কারণ সম্ভবত ১৮৬০ এর দশকের আগে ভারতে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়নি। দ্বিতীয় কলেরা মহামারিটি শুরু হয়েছিল ১৮২৬ সালে। দ্বিতীয় কলেরা মহামারির প্রভাব বাংলা, পাঞ্জাব ও দিল্লিতে ব্যাপক ভাবে দেখা গিয়েছিল। এতে আক্রান্ত হয়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে শত শত লোক মৃত্যুবরণ করেছিল।[১২]

তৃতীয় কলেরা মহামারিটি ১৮৫২ সালে শুরু হয়েছিল এবং ১৮৬০ এর দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই মহামারিটি আগের মহামারির তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও ভয়াবহ ছিল। এর প্রকোপ বাংলা ও বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।[১৩] চতুর্থ কলেরা মহামারি ১৮৬৩ সালে শুরু হয়েছিল। এই মহামারির প্রভাব বঙ্গ সহ মাদ্রাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৬৭ সাল নাগাদ এই মহামারি উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।[১৪] পঞ্চম কলেরা মহামারি ১৮৮১ সালে শুরু হয়েছিল। পঞ্চম কলেরা মহামারি আগের চারটি মহামারির তুলনায় কম প্রভাবশালী ছিল।[১৫] ষষ্ঠ কলেরা মহামারিটি ১৮৯৯ সালের দিকে শুরু হয়েছিল এবং বম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজে এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়।[১৬] এই মহামারি প্রায় ২৫ বছর (১৮৯৯-১৯২৪) স্থায়ী হয়েছিল।[১৭]

কলেরা মহামারির প্রকোপ সেনাবাহিনীতেও পরিলক্ষিত হয়। এই রোগের প্রতিকারক হিসেবে কোয়ারেন্টাইন প্রয়োগ করেছিল তৎকালীন সরকার। কলেরা রোগের চিকিৎসার জন্য সরকার কলেরা হাসপাতালও চালু করেছিল। কলেরা প্রকৃতপক্ষে সংক্রামক রোগ কিনা তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। Major G.B Mallson স্যানেটারি বিভাগের অধিকর্তা যুক্তি দিয়ে কলেরা চিকিৎসার সতর্কতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে ছিলেন। রোগের সংক্রমণ যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও তিনি বলেছিলেন। তৎকালীন সরকার তীর্থযাত্রীদের জন্য শিবির, হাসপাতাল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। অসুস্থদের জন্য ওষুধ ও জীবাণুনাশকও ব্যবহার করা হচ্ছিল।[১৮]

এই রোগের মহামারির আকার ধারণ করার প্রধান কারণ ছিল ব্রিটিশ কাঠামোগত গাফিলতি। তবে তৎকালীন সমাজ এই রোগের উপশমের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে বরং তারা কুসংস্কারের পন্থা অবলম্বন করেছিল যা এই মহামারির ভয়াবহ আকার ধারণ ও ধ্বংসাত্মক মৃত্যু তাণ্ডব এই দুইয়ের জন্য দায়ী।

গুটি বসন্ত

বাংলা তথা ভারতের মহামারির ইতিহাসে আর একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ হল গুটি বসন্ত। ভারতে এই রোগটিও মহামারির আকার ধারণ করেছিল। এই রোগটি ভারিওলা ভাইরাস ঘটিত একটি রোগ। দেহের উপর ছোট ফোস্কা, গুটি ইত্যাদি হল এই রোগের লক্ষণ।[১৯] বিশ্বব্যাপী এই মহামারির ৮৫% ভারতে সংগঠিত হয়েছিল। এই মহামারি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। এই মহামারিতে ১৫০০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।[২০] এটি মহামারির ইতিহাসে প্রথম রোগ যেটি WHO দ্বারা নির্মূল করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।[২১]

বসন্তকালে এই রোগের প্রকোপ বাংলায় শুরু করেছিল, তাই এটি গুটি বসন্ত নামেও পরিচিত। ১৯৯৬ সালে স্যার এডওয়ার্ড জেনার সর্বপ্রথম এই রোগের সঠিক ও সফল টীকা দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। স্যার এডওয়ার্ড জেনার আবিষ্কৃত অ্যান্টি ভাইরাসটি Tecovirimat (TPOXX) নামে পরিচিত।[২২] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গুটি বসন্তকে সংক্রামক হিসেবে শনাক্ত করা হয়।[২৩] ডঃ ক্যামেরন এর রিপোর্ট অনুযায়ী এবং মেডিক্যাল বোর্ডের রেকর্ড থেকে জানা যায় ১৮৮৮ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে সরকার কর্তৃক প্রতিমাসে ২৬০০ টাকা খরচ করে মোট ৩০ টি গুটি বসন্ত রোগের ভ্যাক্সিন সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল। এই ভ্যাক্সিনটি নিয়মিত ও সার্বজনীন ভাবে প্রথম মাদ্রাজে প্রদান করা হয়েছিল। এরপর এই টীকা প্রতি ৫ বছর অন্তর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।[২৪] কিন্তু বাংলা বা ভারতের বহু অঞ্চলে এই টীকার সঠিক ভাবে সরবরাহ করা হয়নি।

সমগ্র ইউরোপ, ইংল্যান্ড, বাংলাদেশ, পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারতসহ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এই রোগটি মহামারির আকার ধারণ করেছিল। সরকারের উদাসীনতার জন্য বাংলার সর্বত্র টীকাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয় নি। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বাংলায় প্রতি বছর এই মারণ রোগে ৫০০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল।[২৫]

এই রোগটি বাংলায় যত মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল ততই বাংলার মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এর থেকে মুক্তির জন্য তারা দেবী শীতলার উপাসনা ও বিভিন্ন পুজা-পার্বণ চালু করেছিল। এই রোগে আক্রান্ত রোগীকে নিয়ে বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক কাজকর্মের ফলে রোগের সংক্রমণ ও মৃত্যু দুইই তরান্বিত হয়।

সরকার থেকে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ টীকা দেওয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা বাংলায় সঠিক ভাবে প্রদান করা হয় নি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থেকে জানা যায়, টীকাকরণ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত এবং টীকা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীরও যথেষ্ট অভাব ছিল।[২৬] মানুষের অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ ও সরকারের উদাসীনতার জন্য এই রোগে মৃত্যুর হার এত বেশি ছিল।

প্লেগ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা তথা ভারতে প্লেগ নামক রোগটি মহামারির আকার ধারণ করেছিল। Yersinia pestis নামক জুনেটিক ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে প্লেগ রোগটি হয়। ১৮৯৪ সালে Alexandre Yersin, প্লেগ রোগের ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন।[২৭] প্লেগ সাধারণত তিন প্রকারের হয়। ১। নিউমোনিক প্লেগ, ২। বিউবোনিক প্লেগ ও ৩। সেপটিসেমিক প্লেগ। ইতিহাসের পাতায় প্লেগ মহামারির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই প্লেগ fo eugalP' নামে পরিচিত ছিল। এই মহামারি প্রথম মিশJastinian' রে দেখা দেয়, তারপর ক্রমশ অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এরপরে ১৩৪৮

সাল নাগাদ ভয়ঙ্কর মহামারি রূপে প্লেগ মহামারি প্রথমে কনস্ট্যান্টিনোপলে এবং ক্রমে ইউরোপের পশ্চিমভাগে ছড়িয়ে পড়ে। ১৩৪৮ এর পর প্রায় ৩০০ বছর ধরে একাধিক বার প্লেগ মহামারি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

ভারতবর্ষে প্লেগ মহামারির আবির্ভাব ঔপনিবেশিক আমলে। বোম্বেতে প্লেগ মহামারির আকার ধারণ করে ১৮৯৬ সাল নাগাদ। তবে, ১৮৩৬ সাল থেকেই বম্বেতে প্লেগ রোগটির আবির্ভাবের কথা জানা যায়। বাংলায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাব হয়, ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ। এপ্রিল মাস থেকেই এই রোগ বাংলায় মহামারির আকার না নিলেও পরের বছর থেকে এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং ঊনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতেও প্লেগ মহামারি বাংলায় তাণ্ডব চালায়। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল এই রোগ।

প্লেগ দমনের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার ১৮৯৭ সালে মহামারি আইন জারি করে। এই আইন অনুযায়ী প্রয়োজন হলে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করা, মেলা, তীর্থযাত্রা বন্ধ করা, রেল যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, এমনকি প্লেগ সন্দেহে মানুষকে পৃথক করার নীতি গ্রহণ করা হয়।[২৮] তবে বাংলায় এই আইন কার্যকর করা যথেষ্ট অসুবিধা জনক ছিল। এই রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বাংলার সরকারের কোনও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ছিল না এবং এটি স্পষ্ট ছিল যে বাংলার মানুষ ও তাদের নেতাদের বিরোধিতার ভয়ে বাংলা সরকার সামরিক বাহিনী প্রয়োগ করতে রাজি ছিল না। অবশেষে বাংলায় মহামারি প্রতিরোধ করবার জন্য ১৮৯৬ সালের ১০ই অক্টোবর মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। H. H. Risley ছিলেন এই বোর্ডের সভাপতি।[২৯] এই মেডিকেল বোর্ড অফিসিয়াল এবং বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতা এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভারতীয় চিকিৎসকও ছিলেন যারা বাংলার মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করতে সহায়তা করতে সক্ষম ছিলেন।সরকার দ্বারা এই রোগের বাহক অর্থাৎ ইঁদুর মারার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরকার থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছিল। আক্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসা শুরু প্রদান করা না হলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। সরকার কর্তৃক রোগীর ব্যবহৃত সমস্ত কিছুকেই জীবাণুমুক্ত করা হয়েছিল, যাতে এর দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি সংক্রামিত না হয়। সংক্রমণ রোধের জন্য প্লেগ রোগের রুগিদের অন্যদের থেকে আলাদা রাখার প্রয়োজন ছিল। বাংলায় প্রাথমিকভাবে প্রশাসন ঘোষণা করেছিল যে জোর করে আলাদা করা হবে না। বিচ্ছিন্নতার প্রশ্নে উচ্চবর্গকে তাদের বাড়ির মধ্যে পারিবারিক হাসপাতাল স্থাপন এবং অসুস্থদের বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল। তবে দরিদ্র শ্রেণির জন্য এই ব্যবস্থাটি ভালোভাবে কার্যকর হয়নি।[৩০]

ঔপনিবেশিক সরকারের প্লেগ দমন নীতির প্রতিক্রিয়া তীব্র আকার ধারণ করে। সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বোম্বে ও কলকাতায় বিক্ষোভ লক্ষ করা যায়। প্লেগ দমনের জন্য টীকা দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় দাঙ্গা দেখা দেয়, হাসপাতাল জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়, ট্রাম ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং টীকাগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়।[৩১] ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় লোকদের ধারণা ছিল, সরকারী প্লেগ কর্মীরা বাড়ির মহিলাদের পরীক্ষা করবে এবং তার ফলে তাদের সম্মানহানী ঘটবে। এমনকি তাদের ধারণা ছিল, হাসপাতালে ভর্তি হলে জাত বা ধর্ম যাবে।[৩২]

ঔপনিবেশিক বাংলায় মহামারির মোকাবিলায় ছাত্রসমাজ

কোভিড-১৯ মহামারি বিধ্বস্ত এই বঙ্গ দেশের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ভীষণই হতাশাজনক। একটি শব্দগুচ্ছ কীভাবে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব তৈরি করে দিতে পারে, তার জ্বলন্ত নিদর্শন হয়ে থাকবে এই অতিমারি। প্রথম দিন থেকেই মহামারি মোকাবিলায় 'Physical distancing' এর পরিবর্তে 'Social Distancing' শব্দগুচ্ছের ক্রমাগত প্রয়োগ সত্যি সত্যি মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন খবরের চ্যানেলগুলো, খবরের কাগজ আর আমাদের চারপাশের সমাজে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই রকম এক ভয়ঙ্কর অতিমারির দিনে সমাজের সবচেয়ে সৃজনশীল শ্রেণি ছাত্রদের ভূমিকা খোঁজার চেষ্টায় দেখা যায়, মানুষের এই দুর্দিনে তারা নির্লিপ্ত থাকতে পারেনি।

মহামারির মোকাবিলায়, সব স্কুল, কলেজ যখন তালাবন্ধ, যখন অর্থের অভাবে, প্রযুক্তি ব্যাবহারে অক্ষম গৃহবন্দী দরিদ্র ছাত্ররা শিক্ষার মূল আঙিনা থেকে অনেক দূরে, তখন যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্ররা 'Quarantined Students-Youth Network' তৈরি করে 'পৃথিবীর পাঠশালা' খুলেছে। এই Network রাজ্যের ১৭টি জায়গায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর পড়ুয়াদের পঠন পাঠন চালাতে উদ্যোগী হয়েছে। কলকাতার ঠাকুরপুকুর, দমদম, কলেজ স্ট্রীট, বাঘাযতীন ছাড়াও আলিপুরদুয়ারে একটি, হুগলির আরামবাগে দুটি, হাওড়ার পাঁচলা ও বাউরিয়ায়, উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত, অশোকনগর ও হাবরা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলপি, সোনাখালি ও বালিদ্বীপে 'পৃথিবীর পাঠশালা' খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পাঠশালায় খেলা, কার্টুন চ্যানেল, ভিনগ্রহের প্রাণী – সব কিছু নিয়েই আলোচনা হয়। স্কুলের পাঠ্যক্রমের সাথে বাস্তব জগতের মিল বোঝানোর চেষ্টা হয়।[৩৩]

অতিমারির মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত 'Lock down' নীতি দরিদ্র জন সাধারণের উপার্জন ক্ষমতা শূন্যে পৌঁছে দেয়। এই অবস্থায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও বর্তমান ছাত্রদের 'Community Kitchen' প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রশংসনীয়। এই থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী দরিদ্র মানুষদের আহার যোগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া 'nehctiK ytinummoC' aS dnaH' বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবেnitizer' ও 'mask' তৈরি করে তা স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে।[৩৪] শুধুমাত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অতিমারির দিনে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ, হাওড়ার বিজয় কৃষ্ণ গার্লস কলেজ প্রভৃতি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঔপনিবেশিক আমলে সংঘটিত মহামারির দিনগুলিতে বঙ্গের ছাত্র সমাজের ভূমিকা কি ছিল? এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নথিপত্রের অভাব আমাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুব বেশি সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সেই সময়েও ছাত্রসমাজ স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে এগিয়ে এসেছিল। এখানে আমরা তাদের ভূমিকার কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দিক আলোচনা করব।

ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি মোকাবিলায় ব্রিটিশ সরকারের যে ভূমিকা ছিল, তা কখনই পর্যাপ্ত ছিল না। এর ফলে দেশীয় মানুষকেই অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হয়। মহামারির সেই দিন গুলিতে বাংলার ছাত্র-যুব সমাজের সক্রিয়তা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কারনেই ঊনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের একাধিক বাংলা সাহিত্যে বার বার উল্লেখিত হয়েছে মহামারির দিন গুলিতে ছাত্র-যুবদের অবদানের কথা, মানুষের পাশে দাঁড়াবার কথা। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের রমেশ, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শ্রীকান্ত, 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসের বৃন্দাবন, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' উপন্যাসের দেবু, 'ধাত্রী দেবতা' উপন্যাসের শিবনাথ সকলেই তৎকালীন ছাত্র-যুব সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে মহামারির দিনগুলিতে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়।

শুধুমাত্র সাহিত্যের পাতায় নয়, ইতিহাসের পাতাতেও মহামারি মোকাবিলায় ছাত্র-যুব সমাজের অবদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের শেষে ১৮৯৮ -১৮৯৯ সাল নাগাদ বাংলায় বিশেষ করে কলকাতায় প্লেগ রোগ মহামারির আকার ধারণ করে। এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর যোগ্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা প্লেগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ১৮৯৯ সালের ২১শে এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে এক সম্মেলনে ছাত্র সমাজের সামনে 'The Plague and the Duty of the Students' শীর্ষক বক্তৃতায় ভগিনী নিবেদিতা ছাত্রদেরকে প্লেগ মহামারির সময়ে এগিয়ে এসে স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার আহ্বান জানান।[৩৫] এই সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার আহ্বান যে ছাত্র-যুব সমাজের উপর প্রভাব ফেলেছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১০ জন ছাত্র ভলিন্টিয়ার হিসেবে এগিয়ে আসে। প্রতি রবিবার সন্ধ্যাবেলায় তারা নিবেদিতার কাছে উপস্থিত হয়ে সারা সপ্তাহ ধরে তারা কী কাজ করেছে তার রিপোর্ট দিত এবং কর্মসূচিও ঠিক করে নিত। দুর্দিনের

দিনে কী করনীয় আর কী করনীয় নয়, প্লেগের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হবে তা জানিয়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে নিবেদিতা এবং ছাত্র ভলিন্টিয়াররা বিলি করত। এছাড়া এই ভলিন্টিয়ারদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন অঞ্চল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।[৩৬] শুধুমাত্র বক্তৃতা নয়, নিবেদিতা তাঁর কর্মোদ্যোগের মধ্য দিয়েও ছাত্র-যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করেন। একদিন তিনি দেখেন যে বাগবাজারের এক লোকালয়ে জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। যদিও কেউ এটি নিয়ে তেমন উদ্বিগ্ন ছিল না। নিবেদিতা ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি ঝাড়ু ও ঝুড়ি নিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে নেমে পড়েন। তাঁর এই কাজ দেখে ঐ অঞ্চলের কয়েকটি যুবক লজ্জা পেয়ে যায় এবং তাঁর হাত থেকে ঝাড়ু সরিয়ে নিয়ে আবর্জনা এবং পথ পরিষ্কার করতে শুরু করে।[৩৭]

১৯৪৩ সালের মন্বন্তর ও মহামারি মোকাবিলায় ছাত্র সমাজের ভূমিকার বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায় গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বাংলার ছাত্র সমাজ' গ্রন্থে। তাঁর লেখায় মূলত মহামারি মোকাবিলায় নিখিলবঙ্গ ছাত্র ফেডারেশন এর কার্যকলাপ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪৩-৪৪ নাগাদ ছাত্র ফেডারেশনের রণধ্বনি ছিল, যেখানে একজনও ছাত্র ফেডারেশন কর্মী আছে, সেখানেই অন্তত একটি রিলিফ কিচেন খুলতে হবে। অগণিত শহরে ও গ্রামে লঙ্গরখানা খুলে নিরন্ন দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে ছাত্র ফেডারেশনের কয়েক হাজার কর্মী। মহামারির বিরুদ্ধে অভিযানে এগিয়ে এসেছিল কলকাতার মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। মাসের পর মাস গ্রামে পড়ে থেকে তারা সংগ্রাম করেছে মহামারি ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতা সুনীল মুন্সীকে যুগ্ম সম্পাদক করে গড়ে ওঠে ছাত্র ছাত্র-শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটি। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাঞ্জাব, বোম্বাই, বিহার, মাদ্রাজ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য ও ঔষধ নিয়ে বাংলায় ছুটে এল ছাত্রদের গড়া বহু রিলিফ স্কোয়াড।[৩৮]

১৯৪৩ সালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ছাত্র ফেডারেশনের নেতা অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের নেতৃত্বে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে 'কিশোর বাহিনী' নামে নতুন সংগঠনের জন্ম। দেশপ্রেম, জনসেবা, ও সমাজতন্ত্র – এই তিন আদর্শকে সামনে রেখে দুর্ভিক্ষ ও মহামারি প্রতিরোধে কিশোর বাহিনী বাংলার কিশোর-কিশোরীদের অতিপ্রিয় সংগঠন হয়ে ওঠে। অল্পদিনের মধ্যেই এই সংগঠনের মধ্যমণি হয়ে ওঠে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।[৩৯]

ঔপনিবেশিক বাংলায় মহামারি মোকাবিলায় ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণের ধারা আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও অব্যাহত। বর্তমান মহামারির একদিন অবসান হবে। কিন্তু এই মহামারি থেকে শিক্ষা নিয়ে যে নতুন ছাত্র সমাজ গড়ে উঠবে, তারা হাত বাড়িয়ে দেবে দেশের মানুষের দিকে। তাদের নিরলস প্রয়াসেই গড়ে উঠবে এক নতুন দেশ। সমাজ সভ্যতার পথপ্রদর্শক। ছাত্রসমাজের প্রতি ভবিষ্যতের এটাই দাবি।

সূত্র নির্দেশ

১। Samanta, Arabinda, 'Living with Epidemics in Colonial Bengal', Routledge, 2017, page-24

২। তদেব।

৩। তদেব।

৪। Charaka, C.1.3.34, 3.67, Susruta, V.39.69.70.71

৫। দে, সুশান্ত ,(গবেষণাপত্র PhD) ,মেদিনীপুর জেলার জনস্বাস্থ্য ,কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩ / ২৭ -পৃষ্ঠা ,৭-অধ্যায় , https://hdl.handle.net/10603/213475

৬। L. Polu, Sandhya, 'Infectious Disease in India, 1892-1940', Palgrave Macmillan, 2012

৭। https://bigyan.org.in

৮। "বাংলার জনসংখ্যা", মাসিক বসুমতি ,ম বর্ষ১ ,৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩২৯, প্রিস্থা-৫৬১

৯। https:/www.cdc.gov>cholera.com

১০। https:/www.ph.ucla.edu

১১। Pollitzer, Robert, 'Cholera studies:1. History of the disease.' Bulletin of the World Health Organization 10.3, 1954 421.

১২। Swetha, G, V M, Anantha Eashwar, Gopalakrishnan, S, 'Epidemics and Pandemics in India throughout History: A Review Article', Indian Journal of Public Health Research and Development · January 2019, page-1504

১৩। তদেব।

১৪। তদেব।

১৫। তদেব।

১৬। তদেব।

১৭। তদেব।

১৮। Samanta, Arabinda, 'Living with Epidemics in Colonial Bengal', Ibid, page-64

১৯। https://en.m.wikipedia.org/eiki/Smallpox

২০। The control and eradication of smallpox in South Asia, Internet Archive, 2018, Available from: https://web.archive.org/web/20081019023043 / http://www.smallpoxhistory.ucl.ac.uk/, Accessed on 18 July, 2006

২১। Greenough, P, 'Intimidation, coercion and resistance in the final stages of the South Asian smallpox eradication campaign, 1973 – 1975', Socialscience & medicine. 19951; 41(5): 633- 45.

২২। https://emedicire.modscape.com

২৩। https://bn.banglapedia.org.SmallPox.com

২৪। Samanta, Arabinda, 'Living with Epidemics in Colonial Bengal', Ibid, page-81-82

২৫। তদেব। পৃষ্ঠা-৮৪।

২৬। দে, সুশান্ত ,(গবেষণাপত্র PhD) ,মেদিনীপুর জেলার জনস্বাস্থ্য ,কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩ / ৩২ পৃষ্ঠা ,৭-অধ্যায় , https://hdl.handle.net/10603/213475

২৭। https://m-hindustantimes.com

২৮। চক্রবর্তী, দীপেশ গৌতম ভদ্র ও পার্থ) ,"ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি" ,'শরীর সমাজ ও রাষ্ট্র' ,(চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিতআনন্দ, ১৯৯৮।১৬৬-পৃষ্ঠা ,

২৯। chatterjee, srilata, 'Plague and Politics in Bengal', Proceedings of the Indian History Congress, Vol-66, (2005-2006) pp.1194

৩০। Ibid pp.1195

৩১। Bose, Pradip Kumar, 'Health and Society in Bengal, A selection fron Latge, 19th Century Bengali Periodicals, Sage Publication, London, pp.41.

৩২। Bose, Pradip Kumar 'Health and Society in Bengal, A selection fron Latge, 19th Century Bengali Periodicals, Sage Publication, London, pp.41-42.

৩৩। আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৮শে জুলাই, ২০২০।

৩৪। The Indian Express, Online Version, Thursday, 19th July, 2020, 6:07 pm.

৩৫। Nivedita of India, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Kolkata, 2002, pp.28.

৩৬। Ibid

৩৭। Ibid

৩৮। চট্টোপাধ্যায়, গৌতম' ,স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ' চারুপ্রকাশ ।৬৩-পৃষ্ঠা ,

৩৯। চট্টোপাধ্যায়, গৌতম' ,স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ' চারুপ্রকাশ, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪।